بسم الله الرحمن الرحيم

জুমুআর খুতবা (২৭ জুলাই ২০১২)

সৈয়দনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)

বাংলা ডেস্ক নিজ দায়িত্বে খুতবার এই বঙ্গানুবাদ উপস্থাপন করছে।

সৈয়দনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) কর্তৃক লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত ২৭ জুলাই ২০১২-এর (২৭ ওফা, ১৩৯১ হিজরী শামসি) জুমুআর খুতবা।

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم*

بسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ * إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ * اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ * صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ (آمين)

আল্লাহ্ তা'লার অপার কৃপায় আমরা কল্যাণময় রমযান মাস অতিবাহিত করছি। ভাগ্যবান তারা যারা এ মাস থেকে কল্যাণমন্ডিত হবে। রোযার গুরুত্ব বুঝলে এবং সে অনুযায়ী কাজ করলে এ কল্যাণ লাভ হয়। হযরত মহানবী হযরত মোহাম্মদ (সা.) নিঃসন্দেহে যথার্থ বলেছেন, রমযান এলে বেহেশ্তের দরজাগুলো খুলে দেয়া হয়, জাহান্নামের দরজাগুলো বন্ধ করে দেয়া হয় এবং শয়তানকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হয়। কিন্তু সবার জন্যই কি বেহেশ্তের দ্বার খুলে দেয়া হয়, শয়তানকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হয় এবং জাহান্নামের দরজা বন্ধ করে দেয়া হয়? কোনভাবেই সবার জন্য এমনটি হতে পারে না বরং এখানে মু'মিনদের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে। কিন্তু এরপরও প্রশ্ন উঠে, শুধু বাহ্যিকভাবে ঈমান আনলে বা মুসলমান হলে এবং রোযা রাখলেই কি মানুষ এসব কল্যাণ লাভ করবে? এতটুকুই কি যথেষ্ট? এতটুকুই যদি যথেষ্ট হতো তবে কেন আল্লাহ্ তা'লা বার বার ঈমান আনার পাশপাশি সৎকর্মের প্রতি অনেক বেশি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন এবং অনেক বেশি জোড় দিয়েছেন? আল্লাহ্ বলেছেন, কোন মানুষ যদি সৎকর্ম করে তবে সে এর প্রতিদান পাবে তা সে যে ধর্মেরই অনুসারি হোক না কেন। অতএব রোযা রাখা, বা রমযান মাস পেলেই মানুষ বেহেশ্তের উত্তরাধিকারী হয় না বরং এর সাথে আরো কিছু আবশ্যকীয় বিষয় রয়েছে যেগুলো পালন করা একান্ত কর্তব্য। কতিপয় শর্তও রয়েছে যেগুলো পূর্ণ করাও জরুরী এবং এমন সৎকর্মের প্রতিও বিশেষভাবে দৃষ্টি দিতে হবে, যেগুলো পালন করা একজন মু'মিনের জন্য আবশ্যক। অন্যথায় সকালে খাবার খেয়ে সন্ধ্যা পর্যন্ত আর কিছু না খাওয়া (কোন ব্যাপারই না), সারা পৃথিবীতে এমন অনেক মানুষ আছে যারা সকালে খায় আবার সন্ধ্যায় খায়। বরং তথাকথিত কিছু ফকির (সংসারত্যাগী) এমনও অভ্যাস করে, নিজেকে এমন কষ্টে নিপতিত করে যে, তারা কয়েক দিন পর্যন্ত না খেয়ে থাকতে পারে। কিন্তু তাদের মাঝে কোন ইবাদত ও পুণ্যকর্ম থাকে না। পৃথিবীতে আবার অনেক এমন মানুষও আছে যারা অভাবের কারণে অনাহারে দিন কাটায়। তাদের অবস্থা এতই করুন যে, কোন মতে দিনে একবেলা খেতে পায়। আবার এমন লোকও আছে যাদেরকে ডাক্তার কতক বিশেষ খাবার খেতে বারণ করেন। তাদেরও প্রায় সারাদিনই না খেয়ে থাকার মত অবস্থা হয়। আরো কতক মানুষ, বিশেষ করে মহিলারা ডায়েটিং-এর শখের কারণেও প্রায় সারাদিনই না খেয়ে থাকে। এই তো দু'দিন পূর্বে এক মা আমার কাছে এসে বললেন, আমার মেয়ে সবে যৌবনে পা রেখেছে, তার মাথায় ভুত চেপেছে, আমাকে হালকা পাতলা হতে হবে, সে খেতে চায় না। বর্তমানে ওজন কম রাখার বিষয়টি যথেষ্ট জনপ্রিয়তা পেয়েছে। এজন্য সে পানাহার প্রায়

ছেড়েই দিয়েছে আর আমাকে খুবই উৎকণ্ঠার মধ্যে ফেলে দিয়েছে। সে দিনে একবার খায় তাও খুব কম। এভাবে সে এক দেড় মাসে প্রায় ১৪/১৫ পাউন্ড ওজন কমিয়ে ফেলেছে। এটি ছিল এক মায়ের দুঃচিন্তার বিষয়। আর মেয়ে হয়ত এখন ভাবছে, রমযান এসেছে তাই আমি যদি অষ্ট প্রহর (রাতদিনে একবার খেয়ে) রোযা রাখি তবে পুণ্যও হবে, রমযান মাস হওয়ায় শয়তান যেহেতু শৃঙ্খলাবদ্ধ আছে তাই সোয়াবও পাওয়া যাবে, এক ঢিলে আমার দুই পাখি মারা হবে। আমার জানা মতে এমন লোকও আছে যারা রোযা রেখে সারাদিন শুয়ে বসে কাটায়, কোন কাজ করে না, কারণ রোযা রাখতে কষ্ট হবে। আর এভাবে সে মনে করে, পুণ্যের সোয়াব পেয়ে গেছি। মহানবী (সা.) যখন বলেছেন, রোযা রাখ, রমযান এসেছে, শয়তানকে শিকলাবদ্ধ করা হয়েছে, জান্নাতের দরজা খুলে দেয়া হয়েছে এবং জাহান্নামের দরজা বন্ধ করে দেয়া হয়েছে, কাজেই তোমাদের পুণ্যকর্ম করতে হবে। নিঃসন্দেহে তোমরা প্রত্যুষে সেহরী খাও, আল্লাহ্ তা'লা নির্দেশ দিয়েছেন- খাও, আর সন্ধ্যায় ইফতারী কর। যেভাবে আমি বলেছি, অনেকে এমন আছে যারা কোন অপারগতার জন্য অষ্ট প্রহর রোযা রাখে। কিন্তু এর ফলে তোমরা মনে কর না যে, তোমরা রোযার সোয়াব পেয়েছ বা তোমাদের শয়তানকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হয়েছে অথবা তোমাদের জন্য জান্নাতের দরজা খুলে দেয়া হয়েছে এবং জাহান্নাম হারাম হয়েছে। রোযার মাস থেকে একমাত্র সে-ই এ কল্যাণমন্ডিত হতে পারে বা কল্যাণমন্ডিত হবে যে পুণ্যকর্ম করবে, যে তার হৃদয়ে আল্লাহ্ তা'লার ভয়-ভীতি ধারণ করে রোযা রাখবে এবং এর পাশপাশি নিজের প্রতিটি কর্ম আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির জন্য করার চেষ্টা করবে। মহানবী (সা.) আরো বলেছেন, যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে এবং আত্মজিজ্ঞাসার সাথে রোযা রাখবে তার রোযা কবুল হবে, জান্নাতকে তার নিকটবর্তী করা হবে এবং তার শয়তানকে শিকলাবদ্ধ করা হবে।

এসব পুণ্যকর্ম বা রোযা যেখানে সৎকর্মের প্রতি পূর্বাপেক্ষা অধিক মনোযোগী করবে সেখানে একজন মু'মিনকে মন্দকর্ম থেকে বিরত হতে, নিজের বদভ্যাস দূর করতে সচেষ্ট করবে এবং এজন্য সে পরিশ্রম বা সাধনা করবে। একজন মু'মিন তার ইবাদতের মানও উন্নত করার চেষ্টা করবে। শুধু ফরযের প্রতিই মনোযোগী হবে না, আর এগুলো পালনেই সচেষ্ট হবে না বরং নফলের প্রতিও মনোযোগী হবে এবং সেগুলো পালনের ক্ষেত্রেও একজন মু'মিন সর্বাত্মক চেষ্টা করবে। আর যখন বান্দার অধিকার সুরক্ষার প্রতি মনোযোগী হবে, আর্থিক কুরবানীর প্রতি মনোযোগী হবে এবং গরীবের অধিকার প্রদানের ব্যাপারেও সচেষ্ট হবে তখনই রমযান মাস হতে পুরোপুরিভাবে কল্যাণমন্ডিত হওয়া সম্ভব হবে। মহানবী (সা.)-এর আর্থিক কুরবানীর বিষয়ে হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, তিনি (সা.) রমযান ছাড়াও সারা বছরই উদারহস্তে দান-খয়রাত করতেন, কুরবানী করতেন। এ কুরবানী ও সাহায্য-সহায়তা তিনি (সা.) এমনভাবে করতেন, যার কোন তুলনা নেই এবং কেউ এর মোকাবিলা করতে পারত না। কিন্তু রমযান মাসে মনে হতো, এমনভাবে দান-খয়রাত করছেন যেন প্রবল ঝড়ো বাতাস বইছে। ইবাদতের চরম সীমাও ছাড়িয়ে যেত। এমনিতেই মহানবী (সা.)-এর ইবাদতের কোন তুলনা ছিল না কিন্তু রমযানে তিনি আরো বেশি অতুলনীয় হয়ে যেতেন। মহানবী (সা.) আমাদের বলেছেন, এটি মনে কর না যে, রমযান এসেছে তাই কোন কিছু না করে শুধু রোযা রেখেই সব পেয়ে যাবে! এ থেকে তোমরা কীভাবে কল্যাণমন্ডিত হতে পার— সে বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে তিনি (সা.) বলেছেন, এক হাদীসে এসেছে। {হুযূর (আই.) বলেন}, একটি হাদীস আমি পূর্বেই বলেছি, তোমরা পুরো বিশ্বাস ও আত্মজিজ্ঞাসার চেতনায় সমৃদ্ধ থেকে (রোযা) রাখ, এখন এ বিষয়ের প্রতিও বিশেষ ভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই যে, মহানবী (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি মিথ্যা বলা ও প্রতারণামূলক কাজ পরিত্যাগ না করে আল্লাহ্ তা'লার কাছে তার অভুক্ত ও পিপাসার্ত থাকার কোন মূল্য নেই। রোযার রীতি-নীতি পালন করাও জরুরী। মহানবী (সা.) উম্মতের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছেন, মিথ্যা বলা এবং প্রতারণামূলক কাজ করা থেকে যে বিরত না হয় তার রোযা নেই। এ কথার মাধ্যমে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম মন্দকর্ম হতে শুরু করে বড় বড় মন্দকর্মের প্রতিও দৃষ্টি আর্কষণ করেছেন।

মহানবী (সা.) এক ব্যক্তিকে সর্বাবস্থায় সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার কথা বলে তাকে তার সমস্ত দুর্বলতা, ভুল-ভ্রান্তি ও পাপ থেকে পবিত্র করে দিয়েছেন। এ উদাহরণও পাওয়া যায় যে, যাকে বলেছিলেন, তোমাকে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে হবে আর সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার প্রতিজ্ঞার ফলে তার সমস্ত চারিত্রিক ও আধ্যাত্মিক দুর্বলতা দূর হয়েছে। অধিকন্তু দেখুন! মিথ্যাকে আল্লাহ্ তা'লা শির্ক'এর সমতুল্য আখ্যা দিয়েছেন। যেভাবে তিনি বলেছেন, فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ অর্থাৎ অতএব তোমরা প্রতিমা সমূহের অপবিত্রতা এড়িয়ে চল এবং মিথ্যা কথা বলাও পরিহার কর (সূরা আল্ হাজ্জ-৩১)।

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, অর্থাৎ 'মূর্তি ও মিথ্যার অপবিত্রতা পরিহার কর'। এটি একটি পরিভাষাগত অনুবাদ। তিনি (আ.) আরো বলেন, মূর্তিপূজা ও মিথ্যা বলা পরিত্যাগ কর। অর্থাৎ মিথ্যাও এক ধরনের মূর্তি, এর উপর যারা ভরসা করে তারা আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করা ছেড়ে দেয়। কাজেই মিথ্যা বললে আল্লাহ্‌র সাথেও সম্পর্ক থাকে না। অতএব মহানবী (সা.) যখন বলেছেন, যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা বলে এবং প্রতারণামূলক কাজ করে তার রোযা নেই। এর কারণ, একদিকে রোযাদারের দাবী, আমি আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশে রোযা রাখছি। কেননা পবিত্র কুরআনের যেখানে রোযা ফরয হবার নির্দেশ আছে সেখানে আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ অর্থাৎ হে যারা ঈমান এনেছ, তোমাদের জন্য রোযা রাখা ফরয করা হয়েছে (সূরা আল্ বাকারা-১৮৪)। কাজেই একদিকে তোমরা রোযা রাখ, আর অন্যদিকে যার নির্দেশে রোযা রাখা হচ্ছে, অর্থাৎ যদিও একদিকে আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশে রোযা রাখছে, কিন্তু অন্য দিকে যাঁর নির্দেশে রোযা রাখা হচ্ছে তাঁর বিপরীতে মিথ্যাকে আল্লাহ্ হিসেবে দাঁড় করানো হচ্ছে। অতএব এ দু'টি কাজ একসাথে হতে পারে না। মহানবী (সা.) আরো বলেছেন, আল্লাহ্ তা'লা বলেন, **'মানুষ তার সকল কাজ নিজের জন্য করে কিন্তু রোযা আমার জন্য রাখে আর আমি নিজেই এর প্রতিদান হব।'** কাজেই একটি কাজ আল্লাহ্‌র নির্দেশে করা হয়, আল্লাহ্ তা'লার জন্য ও তাঁর ভালবাসা লাভের জন্য করা হয় আর এ বাসনা করে যে, আমার এ রোযার প্রতিদান আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং হবেন অর্থাৎ এ প্রতিদানের কোন সীমা নেই। কেননা আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং যদি প্রতিদান হয়ে যান তাহলে সে প্রতিদানের নির্দিষ্ট কোন সীমা থাকে না তাহলে এটি সম্ভবই নয় যে, সে ব্যক্তির দৈনন্দিন জীবনে, নিজের কথাবার্তায় ও কাজ-কর্মে মিথ্যা যুক্ত হবে। মহানবী (সা.) এটি বলেন নি যে, শুধু মুখ দিয়ে মিথ্যা বলবে না বরং ব্যবহারিক মিথ্যাকেও এর সাথে যুক্ত করেছেন, আর ব্যবহারিক মিথ্যার অর্থ হচ্ছে, মানুষ যা বলে তা করে না। রোযাতে ইবাদতের মান উন্নত হওয়া উচিত, নফলের মান উঁচু হওয়া উচিত। কিন্তু কোন মানুষ যদি এর জন্য চেষ্টা না করে, আর রোযার আগে যেভাবে জীবন অতিবাহিত করছিল সেভাবেই অতিবাহিত করে তবে এটি কোন ভাল কাজ নয়। মহানবী (সা.) বলেছেন, **'রোযাদারের সাথে কেউ যদি ঝগড়া করতে আসে তবে সে যেন তাকে বলে দেয় 'আমি রোযাদার' এবং উত্তর না দেয়'**। অতএব এটি হল রোযার করণীয়— যা পালন করা হয়েছে। কিন্তু কেউ যদি ঝগড়াটের প্রতি উত্তর দেয় তবে তা হবে ব্যবহারিক মিথ্যা। কেউ যথাযথভাবে নিজের দায়িত্ব পালন না করলে তা হবে ব্যবহারিক মিথ্যা। অন্যের অধিকার সংরক্ষণ করা না হলে তা হবে ব্যবহারিক মিথ্যা। স্বামী-স্ত্রীর মাঝে ঝগড়া চলছে আর রমযানে নিজেদের মাঝে এ নিয়্যতে যদি পরিবর্তন সৃষ্টি না করে যে, আমরা এখন এই রমযান মাসের সুবাদে আমাদের সর্ম্পকের উন্নয়ন ঘটাব এবং পারস্পারিক প্রেম-প্রীতি ও ভালবাসার সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করব যাতে এ রমযানে আল্লাহ্ তা'লার ভালবাসা লাভ করতে পারি, যেন আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং আমাদের প্রতিদান হয়ে যান; নতুবা নিঃসন্দেহে এ দাবী শুধু বুলিসর্বস্ব হবে যে, আমরা আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির জন্য রোযা রাখছি। কেননা কার্যকলাপ তাকে মিথ্যা প্রমাণ করছে। ব্যবহারিক মিথ্যার আরো অনেক দিক আছে। এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর বিষয়গুলো হল, রোযা রাখার পরও নিজেদের ইবাদত, যিক্‌রে ইলাহী, নফল পড়া এবং কুরআন তিলাওয়াতের প্রতি মনোযোগ সৃষ্টির উপর নিজেদের ব্যবসা-বাণিজ্য, জাগতিক উদ্দেশ্য এবং জাগতিক লাভকে প্রাধান্য দেয়া

হয়। কেউ কেউ এ ব্যাপারে আরো এক ধাপ এগিয়ে আছে, তারা তাদের লাভের জন্য এবং জাগতিক উন্নতির জন্য ব্যবসা ক্ষেত্রে মিথ্যা বলে। এমন মনে হয় যেন আল্লাহ্‌র চেয়ে মিথ্যা বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কাজেই ব্যবহারিক ও মৌখিক মিথ্যা এক ধরনের শির্‌ক। মহানবী (সা.) বলেছেন, এমন রোযাদারের রোযা সত্যিকার অর্থে অভুক্ত থাকা বৈ আর কিছু নয়। কেননা আল্লাহ্ তা'লার দৃষ্টিতে এর কোন মূল্য নেই। রমযান নিশ্চিত ভাবে বিপ্লবের কারণ হয়ে থাকে। এতে শয়তানও শিকলাবদ্ধ থাকে, জান্নাতও নিকটবর্তী হয়। কিন্তু এগুলো তাদের জন্য যারা নিজেদের ব্যবহারিক জীবনে পবিত্র পরিবর্তন আনয়নের চেষ্টা করে। যারা নিজেদের প্রতিটি কথা ও কাজ আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অনুযায়ী করার চেষ্টা করে, আল্লাহ্ তা'লার নিকটবর্তী হবার চেষ্টা করে এবং নিজেদের উপর আল্লাহ্ তা'লার অনুশাসন প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে যেন আল্লাহ্ তা'লার দয়া, ক্ষমা ও মার্জনা যা সাধারণ দিনের চেয়ে এ মাসে অনেক বৃদ্ধি পায় তা থেকে সর্বাধিক উপকৃত হয় এবং নিজেদের প্রবৃত্তির প্রতিমা ও মিথ্যা খোদা যা অজ্ঞাতসারে বা অনেক সময় জ্ঞাতসারে আল্লাহ্ তা'লার বিপরীতে দন্ডায়মান হয় সেগুলো চূর্ণ-বিচূর্ণ করে বাতাসে উড়িয়ে দেয়। এরূপ চেষ্টা-সাধনার ফলে মানব প্রকৃতিতে এক ধরনের বিপ্লব সাধিত হয়। আল্লাহ্ তা'লার অনুশাসন পালনের জন্য রোযার পাশাপাশি ইবাদতের মান অর্জন করা প্রয়োজন, বেশি বেশি কুরআন শরীফ পাঠ ও তিলাওয়াত করা এবং এর শিক্ষা সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করা প্রয়োজন; এছাড়া এসব ইবাদতের প্রভাব, পবিত্র কুরআন পাঠের প্রভাব নিজের বাহ্যিক অবস্থা এবং আচার-ব্যবহারেও প্রস্ফুটিত হওয়া আবশ্যক। যেন ব্যবহারিক সত্যতার বহিঃপ্রকাশ ঘটে।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) একস্থানে বলেন, **'এখন আমার এ উপদেশ দেয়ার প্রয়োজন নেই যে, তোমরা হত্যা কর না কেননা চরম দুষ্ট প্রকৃতির মানুষ ছাড়া আর কে অন্যায়ভাবে হত্যার উদ্যোগ নেয়। কিন্তু আমি বলছি, অন্যায়ের ব্যাপারে হঠকারী হয়ে সত্যকে হত্যা কর না। যদি শিশু বা কোন বিরোধীর কাছেও সত্য পাও তবে তাৎক্ষণিকভাবে নিজেদের অসাড় যুক্তি পরিত্যাগ করে সত্য গ্রহণ কর'**। (এমন নয় যে, আমার কোন বিরোধী সত্য কথা বলছে তাই জিদের বশে আমি তা গ্রহণ করব না। যুক্তি দিও না এবং বিতর্কও কর না। বরং এগুলো পরিত্যাগ করে সত্যকে গ্রহণ কর)। হুযূর (আ.) বলেন, **'সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হও এবং সত্য সাক্ষ্য দাও। যেভাবে মহা প্রতাপান্বিত আল্লাহ্ বলেন,** فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ (সূরা আল্ হাজ্জ-৩১)। **অর্থাৎ প্রতিমা সমূহ্ ও মিথ্যার অপবিত্রতা থেকে আত্মরক্ষা কর কেননা এটি (মিথ্যা) মূর্তির চেয়ে কম নয়'**। তিনি (আ.) বলেন, **'যে জিনিস তোমাদের সত্য বিমুখ করে সেটিই তোমাদের জন্য প্রতিমা স্বরূপ। তোমাদের পিতা-ভাই বা বন্ধু-বান্ধবের বিরুদ্ধে হলেও সত্য সাক্ষ্য দাও। কোন শত্রুতা যেন তোমাদেরকে এথেকে বিরত না রাখে'**। কোন ধরনের শত্রুতা যেন তোমাদের সততায় বাধার সৃষ্টি না করে। তিনি (আ.) আরো বলেন, **'কথার আঘাত ভয়ংকর হয়ে থাকে তাই একজন মুত্তাকী নিজের ভাষা সংযত রাখে। তার মুখ থেকে তাক্বওয়া পরিপন্থী কোন কথা বের হয় না। অতএব তোমরা তোমাদের চিহ্বার উপর কর্তৃত্ব বিস্তার কর, জিহ্বা যেন তোমাদের উপর কর্তৃত্ব না করে, যার ফলে তোমরা আবোল-তাবোল বকতে থাক'**।

অতএব এটি হল, তাক্বওয়া বা খোদাভীতি। এ রমযানে তাক্বওয়া অবলম্বন করার এবং এর উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার সর্বোচ্চ চেষ্টা করা উচিত যেন আমরা আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য লাভ করতে পারি এবং সেসব জান্নাতে প্রবেশ করা আমাদের জন্য যেন সহজ হয় যেগুলোর দ্বার খুলে দেয়া হয়েছে।

আমাদের মাঝে প্রত্যেকে যদি আত্মবিশ্লেষণ করে তাহলে স্বয়ং বুঝতে পারবে যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর এ সকাতর বাণী এবং উপদেশের প্রতি কতজন অনুশীলণ করছে। তিনি বিশেষভাবে ইযালায়ে আওহাম গ্রন্থে নিজ অনুসারীদেরকে অর্থাৎ নিজ জামাতের সদস্যদেরকে এ উপদেশ প্রদান করেছেন। আমাদের প্রত্যেকে যদি ন্যায়বিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে সত্যকে পরাভূত হওয়া থেকে রক্ষা করে তাহলে আমাদের পারিবারিক সমস্যাগুলোরও সমাধান হয়ে যাবে। আমাদের এখানে ভাই-ভাইয়ের মধ্যে যে বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়,

বিভিন্ন সময় কাযা বোর্ডে নালিশ আসে, তাও দূর হয়ে যাবে। কমপক্ষে আমাদের আহমদী সমাজে লেনদেনের যে সমস্যা বিরাজমান আছে, তাও দূর হয়ে যাবে। সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত না থাকার কারণে এবং নিজের আমিত্বকে প্রাধান্য দেবার কারণে এসব সমস্যা সৃষ্টি হয়। তাই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, দায়িত্ববোধের চেতানায় এতটাই সমৃদ্ধ হও যে, কোন শিশুও যদি বলে তবে তা মেনে নিবে– তাহলে অনেক মন্দ বিষয় থেকে পরিত্রাণ পাবে। তখন আমিত্বের কারণে কেউ ভাববে না যে, এই ছোট্ট শিশু আমাকে উপদেশ দিচ্ছে! এ তুচ্ছ ব্যক্তি আমাকে সত্যের পানে পথ প্রদর্শন করছে! এ দরিদ্র ব্যক্তি আমাকে সত্যের কথা বলছে! কাজেই সত্য গ্রহণ করার জন্যও বিনয়ের প্রয়োজন। আর এ বিনয় এমন এক পুণ্য যা খোদা তা'লা খুবই পছন্দ করেন। তাই দেখ! সত্যের পুণ্যের সাথে আরো কত পুণ্য জন্ম লাভ করছে। এক পুণ্যের পর অন্যান্য পুণ্যও সৃষ্টি হতে থাকে। আর এটিই মানুষকে আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি ভাজন বানিয়ে দেয়। অন্যান্য বিষয়ের সাথে উদ্ধৃতিতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাদেরকে বলেছেন তা হল, যে বিষয় তোমাদেরকে সত্য থেকে বিমুখ করে দেয় সেটিই তোমাদের উন্নতির পথের মূর্তি স্বরূপ। তাই রমযান থেকে যদি আমাদের পূর্ণ কল্যান লাভ করতে হয়, যদি আমরা শয়তানের শিকলাবদ্ধ হওয়া, জাহান্নামের দরজা বন্ধ হওয়া এবং জান্নাতের দরজা উন্মুক্ত হওয়া থেকে পূর্ণ লাভবান হতে চাই, তবে আমাদেরকে পূর্ণরূপে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। আমাদের কিবলা খোদা তা'লার দিকে হতে হবে, তবেই আমরা আল্লাহ্ তা'লার এ বাণী থেকে কল্যাণ লাভ করতে সক্ষম হব যে, আমি তোমাদের জন্য রমযান মাসে, রমযানের কল্যাণে জান্নাতের দরজা খুলে দিয়েছি। মহানবী (সা.)-এর এই বাণীর প্রতি মনোযোগী হলে এবং আমল করলে আমরা জান্নাতের দরজা লাভ করব। তা হল, নিজ কথা ও কাজে সততার মান উন্নত করতে হবে। এ দিকে যদি মনোযোগ না থাকে তবে তোমাদের পিপাসার্ত বা ক্ষুধার্ত থাকায় খোদা তা'লার কোন প্রয়োজন নেই। ইবাদত এবং বিভিন্ন ধরনের পুণ্যের পথ বাতলে দিয়ে খোদা তা'লা উক্ত পথের পথিকদের জন্য পুরস্কার নির্ধারণ করেছেন। রমযান মাসে ঐসব ইবাদত এবং পুণ্যের মাধ্যমে ঐ নিয়ামতরাজি অর্জন করার সকল পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছেন, যা খোদা তা'লার নিজ বান্দার প্রতি অপার অনুগ্রহ এবং দয়া স্বরূপ। অনন্ত পুরস্কারের ধারা সূচিত করেছেন এবং বলেছেন, 'এসো, আমার সন্তুষ্টির জান্নাতসমূহে প্রবেশ কর'। কিন্তু স্মরণ রাখবে, এর মাঝে প্রবেশ করার জন্য কথা ও কাজে সত্য অবলম্বন করতে হবে। যদি এ কিবলার অনুসরণ কর, তবে যেভাবে আজকাল প্রত্যেক গাড়ীতে নেভিগেশন লাগানো হয়, নেভিগেশনের মাধ্যমে তোমরা সঠিক গন্তব্যে পৌঁছতে পার, সেভাবে তোমরাও তোমাদের অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে পারবে। অন্যথায় রমযান সত্ত্বেও তোমরা দিকভ্রান্ত হবে। জাগতিক যে নেভিগেশন রয়েছে, এতে অনেক সময় ভুলও হয়ে যায়। অনেক সময় সঠিক পথ প্রদর্শিত হয় না। নতুন নতুন রাস্তা নির্মিত হয় আর তা দেখাও যায় না। অনেক সময় দু'টি পথ থেকে একই গন্তব্যের দিকে পথ নির্দেশিত হয়। দীর্ঘ পথ ঘুরতে হয় অথবা সঠিক পথ অন্বেষণে মানুষ অলি-গলিতে ঘুরতে থাকে। ট্রাফিকে আটকে যায়। কিন্তু যদি খোদা তা'লার দিকে কিবলা সঠিক হয়, তবে সোজা জান্নাতের দরজায় মানুষ পৌঁছে যায়। তাই এ রমযানে আমাদের প্রত্যেককে নিজ কিবলা ঠিক করার চেষ্টা-সাধনা করা প্রয়োজন। নিজের কথা ও কাজের মান উন্নত করুন এবং খোদা তা'লার সন্তুষ্টির জান্নাতে প্রবেশের চেষ্টা করুন। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এর সৌভাগ্য দিন।

এ বিষয়টি আমি কিছুটা সংক্ষেপ করেছি। হয়ত আল্লাহ্ চাইলে বাকী বিষয় আগামী জুমুআয় বর্ণনা করব। সংক্ষিপ্ত করার কারণ, এখন আমি জামাতের একজন প্রবীন বুযূর্গ সম্পর্কে বলতে চাই যিনি সম্প্রতি মৃত্যু বরণ করেছেন। এ বুযূর্গ হচ্ছেন, মোকার্‌রম চৌধুরী শাব্বির আহমদ সাহেব। পাকিস্তানের সব আহমদী না হলেও জামাতের অধিকাংশ মানুষ তাকে চিনেন। বিশেষভাবে পুরনো আহমদীরা অবশ্যই তাঁকে চিনে থাকবেন। তিনি দীর্ঘদিন উকিলুল মাল-আউয়াল (১) হিসেবে জামাতের সেবা করার সুযোগ পেয়েছেন। তিনি

সেই বুযূর্গ যিনি জামাতের বর্তমান ব্যবস্থাপনার ভিত্তিপ্রস্তর না হলেও কমপক্ষে মধ্যবর্তী ইট হিসেবে অবশ্যই ভূমিকা পালন করেছেন। তিনি হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর কাছ থেকে সরাসরি তরবীয়ত পেয়েছেন। নিঃস্বার্থভাবে জামাতের সেবা করার সৌভাগ্য পেয়েছেন। আজ আমরা যে ফল ভোগ করছি তাতে এসব পুরনো লোকদের নিঃস্বার্থ সেবার অনেক বড় ভূমিকা রয়েছে। তিনি ছাড়াও আরো কয়েকজন মৃত্যুবরণ করেছেন। তাদের সম্পর্কেও বর্ণনা করব।

আমি মোকার্‌রম ও মোহতরম চৌধুরী শাব্বির আহমদ সাহেবের কিছু উল্লেখযোগ্য দিক সংক্ষেপে স্মৃতিচারণ করছি। তিনি গত ২২ জুলাই ২০১২ তারিখে ৯৫ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন, إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون । তাঁর পিতা হযরত হাফিয আব্দুল আযীয সাহেব এবং মাতা হযরত আয়েশা বেগম সাহেবা (রা.) উভয়ই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী ছিলেন। কিন্তু তাঁর দাদা দ্বিতীয় খলীফার যুগে বয়আত করেছিলেন। তাঁর দাদা চৌধুরী নবী বখ্‌শ সাহেব তৎকালীন জম্মু রাজ্যের সম্মানিত জমিদার ছিলেন। মুসলমানদের উপর বিভিন্ন বাধ্য-বাধকতা আরোপের কারণে রানী ভিক্টোরিয়ার যুগে তিনি হিজরত করে শিয়ালকোট চলে আসেন। চৌধুরী শাব্বির সাহেবের পিতাও উত্তম চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। হাফেযে কুরআন হবার কারণে নিজ অঞ্চলে খুবই পরিচিত ছিলেন। এজন্য তিনি নিজ সন্তানদেরও ধর্মীয় পরিবেশে প্রতিপালন করেছেন। চৌধুরী শাব্বির সাহেব স্কচ মিশন মডেল স্কুল শিয়ালকোট থেকে প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন করেন। ১৯৩১ সনে অষ্টম শ্রেণী পাশের পর তাঁর পিতা শিক্ষার্জনের জন্য তাঁকে কাদিয়ান পাঠিয়ে দেন। তা'লীমুল ইসলাম কলেজ কাদিয়ান থেকে তিনি মাধ্যমিক পাশ করেন। তিনি হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানীর সান্নিধ্যে থেকে তরবীয়ত লাভ করেন। নযম পাঠের খুব শখ ছিল তাঁর, অনেক সুযোগও পেয়েছেন। অন্যান্য নযম ছাড়াও তিনি প্রথমবার কাদিয়ানে সীরাতুন্নবী জলসায় হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর বক্তৃতার পূর্বে নযম পাঠ করেন। এরপর মেট্রিক পাশের পর যেহেতু কাদিয়ানে কোন কলেজ ছিল না, তাই শিয়ালকোটের মারে কলেজ থেকে তিনি বিএ পাশ করেন। কিছু দিন তিনি কাদিয়ানে থাকেন, এরপর হযরত মৌলভী শের আলী সাহেবের সাথে দপ্তরে কাজ করেন। হযরত মৌলভী শের আলী সাহেব যখন কুরআন অনুবাদের কাজে রত ছিলেন, তখন তিনি তার সাথে টাইপিং এর কাজ করতে থাকেন। এরপর তিনি চাকুরীর সন্ধানে লাহোর যান। কিছু কাল সাংবাদিকতার কাজেও জড়িত ছিলেন। তিনি একজন ভাল কবিও ছিলেন, স্বরচিত নযম খুব সুললিত কণ্ঠে পাঠ করতেন। কথাবার্তায় খুব অমায়িক এবং পরিশ্রমী মানুষ ছিলেন। মোটকথা তিনি পুণ্যের একটি ভান্ডার ছিলেন। ১৯৪০ সনে মিলিটারী একাউন্টস্ পরীক্ষা পাশ করেন এবং চাকরীর জন্য নির্বাচিত হন। সেখানে এগার বছর কাজ করেন। কিন্তু এরই মধ্যে ১৯৪৪ সনে তিনি নিজেকে ওয়াক্‌ফের জন্য আবেদন করেন। কিন্তু হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) ১৯৫০ সনে তাঁকে ডাকেন এবং স্বয়ং নিজে তাঁর ইন্টারভিউ নেন। এরপর তিনি চাকরী ছেড়ে দিয়ে রাবওয়ায় চলে আসেন। প্রথমে সহকারী উকিল এবং পরে উকিলুল মাল- আউয়াল হিসাবে আমৃত্যু দায়িত্ব পালন করে গেছেন।

তিনি ৫২ বছর উকিলুল মাল-আউয়াল এবং এর পূর্বে আরো দশ বছর জামাতের সেবা করেন। দ্বিতীয় খিলাফতের যুগ থেকে আজ পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে জামাতের কাজ করার সৌভাগ্য দিয়েছেন। এছাড়া বিভিন্ন সংগঠনের দায়িত্বও উত্তমভাবে পালন করেছেন। তিনি রাবওয়ার কেন্দ্রীয় খোদ্দামুল আহমদীয়ার প্রথম মোতামাদ হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়াও খোদ্দামুল আহমদীয়ার বিভিন্ন পদে থেকে সেবা করেন। আনসারুল্লাহ্‌র নায়েব সদর স'ফে দওম হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন। এরপর বিশেষ সদস্য ছিলেন দীর্ঘদিন। কাজী এবং মজলিস কারপরদাযের সদস্যও ছিলেন। ১৯৬০ সালে হযরত সাহেবযাদা মির্যা বশীর আহমদ সাহেবের স্ত্রীর পক্ষ থেকে বদলী হজ্ব করার সৌভাগ্যও লাভ করেন। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ সফরে যেতেন। তার বেশ কিছু কবিতার আসরও হয়েছে। ১৯৬৫ সাল থেকে ১৯৮৩ সাল পর্যন্ত একাধারে তিনি রাবওয়ার সালানা জলসায় দুর্‌রে সমীন থেকে নযম পাঠের সুযোগ লাভ করেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে

(রাহে.)-এর যুগে ১৯৮৬ ও ১৯৯৮ সালে যুক্তরাজ্যের জলসায়ও নযম পাঠ করেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) একবার তাঁর নযম শুনে বলেছিলেন, আপনি রাবওয়া ও কাদিয়ানের পুরাতন জলসার স্মৃতিকে জাগ্রত করে দিয়েছেন। তার আরেকটি বৈশিষ্ট্য ছিল, তিনি যখনই বিভিন্ন জামাত সফরে যেতেন, প্রজেক্টর ও স্লাইড নিয়ে যেতেন। দীর্ঘ বক্তৃতার পরিবর্তে বিভিন্ন দেশে নির্মিত আমাদের মিশন হাউজ, হাসপাতাল, স্কুল ও মসজিদসমূহ দেখাতেন। যা নিজেদের তরবীয়তেরও কারণ হত এবং কুরবানীসমূহের প্রতিও দৃষ্টি আকর্ষণ করত। ছোট ছোট উপজেলা বা গ্রামে অনেক সময় অ-আহমদীরাও আসত এবং আহমদীয়া জামাতের ইসলাম সেবা দেখানোর ফলে তবলীগেরও সুযোগ সৃষ্টি হত। তিনি যুক্তি-প্রমাণ ও দলীলের পরিবর্তে প্রজেক্টরের মাধ্যমে তবলীগ ও তরবীয়তের অনেক কাজ করেছেন। যতক্ষণ পর্যন্ত তার শক্তি সামর্থ্য ছিল তিনি নিরবধি এ কাজই করে গেছেন। তিনি ২০০৯ সালে এখানে এসেছিলেন এবং খিলাফত জুবিলীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপক রির্পোট উপস্থাপন করার সৌভাগ্য পেয়েছেন। অনুরূপভাবে জামাতের পক্ষ থেকে যুগ খলীফাকে আমাকে জামাতের বিশেষ কোন কাজের উদ্দেশ্যে জুবিলীর যে অর্থ প্রদান করা হয়েছিল তাও তিনিই উপস্থাপন করার সৌভাগ্য লাভ করেন। তাঁর এক ছেলে আমেরিকায় ওয়াক্‌ফে যিন্দেগী এবং সিলসিলাহ্‌র মুবাল্লেগ। দ্বিতীয় ছেলেও ওয়াক্‌ফে যিন্দেগী এবং রাবওয়ায় নায়েব নাযের রিশ্‌তানাতা হিসাবে দায়িত্ব পালন করছে। তৃতীয় ছেলে ফযল আহমদ তাহের খন্ডকালীন ওয়াক্‌ফ করে আফ্রিকায় ছিল, বর্তমানে লন্ডনে যুক্তরাজ্য জামাতের সেক্রেটারী তা'লীম হিসেবে জামাতের সেবা করছে। এই হচ্ছে তাঁর তিনজন ছেলে। তাঁর মেয়ে এবং জামাতাদেরও জামাতের সাথে খুব ভাল সম্পর্ক রয়েছে। তাঁর মাঝে আরো একটি বৈশিষ্ট্য ছিল, তিনি অ-আহমদী আত্মীয়-স্বজনদের নিয়মিত তবলীগ করতেন। তাঁর রীতি ছিল, তাঁর কাছে যেসব পত্র-পত্রিকার আসত বা মতবিরোধ সংক্রান্ত লেখা প্রকাশিত হলে তিনি শিয়ালকোট বা যেখানেই থাকতেন তা তাদের নামে পোষ্ট করে দিতেন। আত্মীয়-স্বজনদের ঠিকানা তাঁর মুখস্ত ছিল। এভাবে আল্ ফযল বা অন্য যে কোন পত্রিকা প্রেরণ করতেন। অফিসের লোকজনের সাথে সুসম্পর্ক বজায় ছিল। তাঁর অফিসের একজন কর্মী লিখেন, একবার তিনি অসুস্থ ছিলেন, তিনি সাধারণত সাইকেল চালিয়ে অফিসে আসতেন। কিন্তু তিনি যখন ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়েন তখন আমিই বলেছিলাম, তাঁকে আনতে গাড়ী পাঠানো উচিত। সম্ভবত এর আগেও হয়ত গাড়ী ব্যবহার করা হতো। যাহোক অফিসের কর্মী তাঁকে নেয়ার জন্য গাড়ী পাঠাতে দেরি করে ফেলে। সেই কর্মী বলেন, গাড়ী দেরিতে এলো কেন এ সম্পর্কে তিনি আমাকে কিছু না বলে একটি খামে ভরে কিছু বাদাম দিয়ে পাঠিয়ে / দিলেন আর সাথে লিখে দেন, এটি আপনার স্মরণ শক্তি বৃদ্ধির জন্য। নম্র ভাষা ও বিনয়ের সাথে উপদেশ দেয়ার এটি তাঁর নিজস্ব রীতি ছিল। তেমনি ভাবে তার মেয়েও বলেন, ঘরেও তিনি সবসময় বিভিন্ন উপদেশ দিতেন, বকা-ঝকা না করে নিজের ব্যবহারিক দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করতেন যা দেখে আমরা নিজেরাই সংশোধন করার চেষ্টা করতাম। অথবা অনেক সময় এমনভাবে কোন কোন ঘটনা শুনাতেন যাতে করে সংশোধনের প্রতি আমাদের মনোযোগ সৃষ্টি হয়ে যেত। তার এক মেয়ে বলেন, সর্বশেষ অসুস্থাবস্থায় কিছুদিন আগেই বলেছিলেন, (আমার প্রতি) পংক্তি অবতীর্ণ হচ্ছে লিখ। এখন আল্লাহ্ তা'লার কাছে আমার প্রার্থনা, আর সেই পংক্তি হল,

ধর্মসেবার জন্য আমার প্রভু - ধর্মসেবার খাতিরে আমায় উৎসর্গ করে দাও
বিদায়ের ক্ষণটি কর আমার জন্য প্রশান্তির - বিদায় বেলার মুহূর্তটি আমার জন্য সহজ করে দাও
আর বিদায়কে আমার জন্য আনন্দঘন করে দাও।

এটি তাঁর শেষ কথা বা বলতে পারেন এটি মৃত্যু শয্যার শেষ পংক্তি। এরপর তাঁর ভেতর এ গুণও ছিল, সর্বদা কৃতজ্ঞচিত্তে খোদার প্রশংসা ও গুণকীর্তন করতেন এবং হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) যখন তার ওয়াক্‌ফ গ্রহণ করেন তখন তাঁকে এই উপদেশ দিয়েছিলেন আর এই উপদেশ প্রত্যেক ওয়াক্‌ফে যিন্দেগীর-ই স্মরণ রাখা উচিত। তিনি বলেছিলেন, জামাতের কাজের ব্যাপারে এমনভাবে চিন্তা করবে যেভাবে এক মা তার

সন্তানের জন্য চিন্তা করে। অতএব তিনি আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় এ উপদেশকে সর্বদা জীবনের পাথেয় বানিয়ে নেন এবং অসুস্থতা সত্ত্বেও তিনি সর্বদা এটি খুব ভালভাবে পালন করেছেন। পরিবারের সাথে তাঁর ভাল সম্পর্ক ছিল। স্ত্রীর প্রতি খুবই খেয়াল রাখতেন কিন্তু যেখানে ধর্মের প্রশ্ন আসত, সফর প্রভৃতিতে যেতে হত তখন তিনি বলে দিতেন, আমি খোদার ধর্মের কাজে যাচ্ছি, খোদা তা'লা আমার কাজ সামলাবেন। আর আল্লাহ্ তা'লা তা সঠিকভাবে করেও দিতেন। এর মাঝে কয়েকবার পরিস্থিতি এমন ছিল যে, তার স্ত্রী অসুস্থ ছিলেন অথবা সন্তান প্রসবের সময়— অত্যন্ত উদ্বেগপূর্ণ পরিস্থিতি ছিল। বাহ্যতঃ এগুলো সাধারণ বিষয় বলে মনে হলেও প্রবীনদের এসব ঘটনা থেকে এ যুগের প্রত্যেক ওয়াক্‌ফে যিন্দেগী ও কর্মীর এমনকি জামাতের সকল কর্মকতার শিক্ষা নেয়া উচিত। তার একজন ইন্সপেক্টর বলেন, অফিসের পক্ষ থেকে বিভিন্ন বই বাঁধাই করা হয়েছিল তিনি সেগুলো দেখছিলেন, এগুলোর মধ্য থেকে একটি 'দুর্‌রে সমীন' বের হল। তিনি এই 'দুর্‌রে সমীন'টি নিয়ে এ্যাকাউনটেন্ট সাহেবকে ডেকে বলেন, এটি আমার ব্যক্তিগত 'দুররে সমীন'। এটিও আপনি বাঁধাই করে দিয়েছেন। তিনি বলেন, এতে কত খরচ হয়েছে? এ্যাকাউন্টেন্ট বলল, সমস্ত বই একসাথে বাঁধানো হয়েছে। কিন্তু তিনি বললেন, না। খোঁজ নাও কত খরচ হয়েছে। অবশেষে খোঁজ নিয়ে ছাড়েন। মাত্র ৮/১০টাকা খরচ হয়েছিল তা এ্যাকাউন্টেন্টকে না দেয়া পর্যন্ত স্বস্তি পান নি। একইভাবে কর্মীরাও একথাই বলেন, খুবই হৃদয়গ্রাহী ভাষায় উপদেশ দিতেন বলে তা আমাদের খারাপ লাগত না। আর এভাবেই আমাদের তরবীয়ত করতেন। প্রায়শঃই নসীহত করে বলতেন, **'প্রত্যেকের স্মরণ রাখা উচিত, আগ্রহভরে আর ভালবাসার সাথে ধর্মসেবা করা উচিত। আর এর বিনিময়ে কোন ধরনের পুরস্কার প্রত্যাশী হওয়া উচিত নয়। সর্বদা স্মরণ রাখবেন! খোদা আপনাকে সেবার সুযোগ দিয়েছেন তাই আপনাকে খোদার সন্তুষ্টি অর্জন করতে হবে।'** এটি অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটি উপদেশ। এভাবে অফিসে আগত অতিথিদের সাথে খুবই শ্রদ্ধা ও সম্মানের সাথে সাক্ষাত করতেন। তিনি দাঁড়িয়ে তাদের সাথে সাক্ষাত করতেন এবং প্রায়ই বলতেন, যেসব অতিথি জামাতের কেন্দ্রে আসেন তারা কিছু আশা-প্রত্যাশা নিয়ে আসেন, তাদের সাথে ভালভাবে সাক্ষাত করা উচিত। আপ্যায়ন করা উচিত। তিনি নিজের কাজ সরিয়ে রেখে তাদের কাজের ব্যাপারে মনোযোগ দিতেন তা যত সময়ই লাগুক বা অফিস বন্ধ হয়ে যাক না কেন। যদি কাজ করা সম্ভব হত তাহলে করে দিতেন আর সম্ভব না হলে বলে দিতেন, পরে বিষয়টি জানা যাবে। কতক অতিথি বা আগন্তুক চাঁদা ইত্যাদির ব্যাপারে আসেন, চাঁদার হিসাব সঠিক না হলে বা চাঁদার আদায়ভুক্তি সঠিক না হলে অনেক সময় তারা বেশ রাগান্বিত হয়ে যান, এখানকার সেক্রেটারী মালদেরও এ অভিজ্ঞতা থেকে থাকবে। এমন পরিস্থিতিতে তাঁর সামনে কেউ রাগান্বিত হলে তিনি নিরব থেকে শুনতেন এবং অবশেষে তারা স্বয়ং লজ্জিত হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করতেন। এছাড়া তিনি কর্মকর্তাদের এবং নিজ সন্তানদেরকে সদকা-খয়রাতের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করাতেন যা বিপদাপদ কাটানোর একটি মাধ্যম এবং বলতেন, এরপর যুগ খলীফাকে লিখ। এটি একটি চমৎকার গুণ ছিল তাঁর। তিনি ইন্সপেক্টরদেরকেও বলতেন, তোমরা যে যখনই বাইরে কোথাও সফরে যাবে জামাতগুলোতে নিজেদের পক্ষ থেকে কোন কথা না বলে যুগ খলীফার বাণী তাদের কাছে পৌঁছাবে। তিনি যখন কাউকে বাইরে পাঠাতেন কোন নায়েবদের বা কোন ইন্সপেক্টরকে তিনি বলতেন, আপনারা কেন্দ্রের প্রতিনিধি তাই নিজেদের কথা ও কাজের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখবেন।

কখনো কখনো অফিসে নির্ধারিত সময়ের চেয়ে অতিরিক্ত সময় দিতে হত। তিনি ভাবতেন অফিসের সময় শেষ হয়ে গেছে এবং কর্মীরা যাতে আবার মন খারাপ না করে তাই তিনি তাদেরকে উত্তম ভঙ্গিতে বলতেন, আপনারা এটি মনে করবেন না যে, অফিসের অন্য কর্মীরা বাড়িতে গিয়ে আরাম করছে বরং এটি মনে করুন, তারা চলে গিয়ে নিজেদের সময় নষ্ট করছে আর খোদা তা'লা আমাদেরকে বাড়তি খিদমত করার সুযোগ দিচ্ছেন। এটি ছিল ধর্মসেবাকে ঐশী কৃপা বা ফযল জ্ঞান করার একটি ব্যবহারিক দৃষ্টান্ত।

আরেকজন কর্মী বলেন, তাঁর মৃত্যুর চার-পাঁচ দিন পূর্বে খাকসার তাঁকে দেখার জন্য গেলে তিনি আমাকে বলেন, নাসের আহমদ নামে কোন একজন কর্মী আমাকে দেখার জন্য এসেছিলেন আপনি কি তাকে চেনেন? আমি তখন বললাম, তাহরীকে জাদীদ দপ্তরে নাসের আহমদ নামে তিন চার-জন কর্মী আছে। এতে তিনি বললেন, গতকাল যে নাসের আহমদ আমার সাথে সাক্ষাতের জন্য এসেছিলেন তাকে আমার সন্তান বলেছে, আমি ঘুমিয়ে আছি তাই তাকে ফিরে যেতে হয়েছে। আপনি তার সন্ধান করুন তিনি কে এবং আমার পক্ষ থেকে ক্ষমা চেয়ে নিন, আমার সন্তান ভুল বুঝেছিল হয়ত আমার চোখ বন্ধ দেখে সে বলে দিয়েছে আমি ঘুমিয়ে আছি আসলে আমি ঘুমোচ্ছিলাম না। মোটকথা এমনই সূক্ষ্মতার সাথে তিনি সব কিছুর প্রতি লক্ষ্য রাখতেন। তিনি নিয়মিত সদকা দিতেন।

যাহোক আমি তাঁর সম্পর্কে সংক্ষিপ্তাকারে বর্ণনা করলাম। আমিও তাঁর সাথে কাজ করেছি এবং এখন পর্যন্ত তাঁর খুব কম গুণাবলীই লিখা হয়েছে, আল্লাহ তা'লার ফযলে অনেক গুণের অধিকারী ছিলেন এবং ক্লান্তিহীনভাবে আর সানন্দে কাজ করতেন। খিলাফতের প্রতি অগাধ বিশ্বস্ততার সম্পর্ক ছিল। যাহোক তিনি একজন বুযূর্গ ছিলেন যিনি একদিকে বিশ্বস্ততার সাথে কাজ করেছেন অপরদিকে যুগ খলীফার সুলতানে নাসীর অর্থাৎ সাহায্যকারী হাত ছিলেন। আর সেই সাথে যুগ খলীফার জন্য অনেক দোয়াও করতেন। আল্লাহ্ তা'লা তার পদমর্যাদা বৃদ্ধি করুন এবং তাঁর মত নিরলস কর্মী সর্বদা জামাতকে দান করতে থাকুন।

এছাড়া যেভাবে আমি বলেছি আরো কয়েকজন ইন্তেকাল করেছেন। চৌধুরী শাব্বির আহমদ সাহেবের এবং অন্য যাদের উল্লেখ করতে যাচ্ছি তাদের গায়েবানা জানাযাও জুমুআর নামাযের পরই আমি পড়াব। তাদের মাঝে একজন হলেন আমাদের মুরুব্বি সিলসিলাহ্ মকবুল আহমদ যাফর সাহেব। তিনি নাযারত ইসলাহ্ ও ইরশাদ বিভাগে দায়ীত্বরত ছিলেন। তার অন্ত্রের পুরোন ব্যাধি ছিল যা অবনতি ঘটে অবশেষে গত ২৫ জুলাই তিনি মৃত্যু বরণ করেন, إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون ।

মরহুম চিনিউট-এর পাশে কোট মোহাম্মদ ইয়ার-এর বাসিন্দা ছিলেন। তিনি ১৯৯৭ থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত আরবীতে মাষ্টার্স করেন এবং এরপর ইশায়াত বিভাগে কাজ করেন। জামেয়া আহমদীয়ার আরবীর শিক্ষক ছিলেন। এরপর তিনি ২০০৭ সালে সিরিয়া গমন করেন। সেখানে তিনি আরবী ভাষায় ডিপ্লোমা করেন। একইভাবে হোমিও প্যাথীর উপরও তার কিছুটা দখল ছিল। অতঃপর সেখান থেকে ফিরে এসে কেন্দ্রীয় ইসলাহ্ ইরশাদ বিভাগে নিযুক্ত হন, তিনি অত্যন্ত জ্ঞান-পিপাসু মানুষ ছিলেন। আর তিনি শুধু জ্ঞান-পিপাসুই ছিলেন না বরং একজন মুরব্বীর মাঝে যেসব গুণাবলী থাকা বাঞ্ছনীয় সেসব গুণাবলীও তার মাঝে বিদ্যমান ছিল। যেমন আমি উল্লেখ করেছি, হোমিও প্যাথীতেও তিনি ডিপ্লোমা করেছিলেন। তেমনিভাবে তিনি গরীবদের সাহায্য করতেন আর অ-সময়েও যদি কোন রোগী চলে আসত তাকেও তিনি ঔষধ দিতেন, নিজের সহকর্মী এবং কর্মীদের সাথে তার খুব ভাল সম্পর্ক ছিল। আল্লাহ্ তা'লা তার পদমর্যাদা উন্নীত করুন। তার সন্তানাদি রয়েছে, তাদেরকেও আল্লাহ্ তা'লা ধৈর্য ও সাহসিকতা দান করুন।

তৃতীয় জানাযা হচ্ছে কাদিয়ানের দরবেশ হাকীম বদরুদ্দীন আমেল সাহেবের স্ত্রী মি'রাজ সুলতানা সাহেবার। গত ১৯ জুলাই ৮৬ বছর বয়সে তিনি মৃত্যু বরণ করেন, إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون । অত্যন্ত নিষ্ঠা এবং বিশ্বস্ততার সাথে তিনিও দরবেশী জীবন যাপন করেছেন। তিনি স্কুল শিক্ষিকাও ছিলেন। অবসর গ্রহণের পরও পড়াতেন। অত্যন্ত ভাল মনের অধিকারিণী, ধৈর্যশীলা এবং সাহসী নারী ছিলেন। লাজনা ইমাইল্লাহ্ কাদিয়ানের জেনারেল সেক্রেটারীও ছিলেন এবং জামাতের বিভিন্ন সেবায় রত ছিলেন। গরীব ছেলে-মেয়েদের নিজের ঘরে রেখে শিক্ষা প্রদান করতেন। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমার পদমর্যাদা উন্নীত করুন।

আর চতুর্থ জানাযা হচ্ছে, শহীদ ডাক্তার মুহাম্মদ আহমদ খাঁন সাহেবের স্ত্রী মরিয়ম সুলতানা সাহেবার। শহীদ মুহাম্মদ আহমদ খাঁন সাহেব কোহাট জেলার টাল-এ শহীদ হয়েছিলেন। মরিয়ম সুলতানা সাহেবার মৃত্যু

হয় ১৮ জুলাই ২০১২ তারিখে, إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ । মরহুমা অত্যন্ত পরিশ্রমী মহিলা ছিলেন। দাওয়াতে ইলাল্লাহ্‌র প্রতি যথেষ্ট আগ্রহ ছিল। ত্যাগী ছিলেন এবং অত্যন্ত দৃঢ় মনোবলের অধিকারিণী ছিলেন। তার স্বামী ডাঃ মুহাম্মদ খাঁন সাহেব শহীদ হলে তার দৃঢ়তা ও দৃঢ়চিত্ততার প্রমান মেলে। এটি ১৯৫৭ সাল অর্থাৎ হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.)-এর যুগের কথা। মরিয়ম সুলতানা সাহেবার পিতার নাম মোহতরম এনায়েত উল্লাহ্ আফগানী। আর তার পিতা মোহতরম এনায়েত উল্লাহ্ আফগানী সাহেবের বয়আতের মাধ্যমে তাদের বংশে আহমদীয়াদের সূচনা হয়। যিনি হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর হাতে বয়আত গ্রহণ করেছিলেন। এনায়েত উল্লাহ্ সাহেব আফগানিস্তানের খোশ্‌ত এলাকার অধিবাসী ছিলেন আর তিনি শহীদ মরহুম হযরত শাহেবযাদা আব্দুল লতীফ সাহেব (রা.)-এর একজন শিষ্য ছিলেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মৃত্যুর পর তার পরিবার আফগানিস্তান থেকে স্থানান্তরিত হয়ে কাদিয়ানে বসতী স্থাপন করেন আর এখানেই তিনি হযরত খলীফাতুল মসীহ আউয়াল (রা.)-এর হাতে বয়আত গ্রহণ করেন।

মরিয়ম সুলতানা সাহেবা জন্মগত আহমদী ছিলেন। আর ১৯৪৯ সালে ডাক্তার মুহাম্মদ আহমদ খাঁন সাহেবের সাথে তার বিয়ে হয়, তিনি হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-এর দেহরক্ষী মীর খাঁন সাহেবের পুত্র ছিলেন। এরপর তারা কোহাট চলে যান। সেখানে তার কাছে একবার এক বিরোধী মৌলভী আসে এবং কোন রোগীর অসুস্থতার কথা বলে ডাক্তার সাহেবকে নিয়ে যায়, সেখানে নিয়ে তাকে গুলি করে শহীদ করা হয়। এরপর যখন তার লাশ আসে, তার বাড়ীর আশে পাশে কোন আহমদী পরিবারও ছিল না, তিনি একা ছিলেন, তাদের পরিবারই একমাত্র আহমদী পরিবার ছিল। তার ছোট ছোট সন্তান ছিল। তার স্বামী মূসীও ছিলেন। লাশ ঘরে পরে থাকে, শিশু সন্তানরা কান্নাকাটি করছিল, তিনি কি করবেন বুঝে উঠতে পারছিলেন না। সমবেদনা জানানোরও কেউ ছিল না, পরামর্শ দেবারও কেউ ছিল না, যোগাযোগেরও তেমন কোন ব্যবস্থা ছিল না, ফোনও ছিল না। তখন তার (মরিয়ম সাহেবার) এই চিন্তাও ছিল, ডাক্তার সাহেব মূসী ছিলেন তাই তাকে রাবওয়া নিয়ে যেতে হবে। যাহোক তিনি অত্যন্ত সাহসিকতা দেখিয়ে একটি ট্রাক ভাড়া করেন এবং তার মধ্যে কফিনও রাখেন আর সন্তানদেরও ট্রাকে করে নাখলায় নিয়ে আসেন যেখানে সে দিনগুলোতে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) অবস্থান করছিলেন, সেখানেই তার জানাযা পড়ানো হয়। তারপর লাশ রাবওয়া নিয়ে আসেন।

মরহুমা কঠোর পরিশ্রমের সাথে সন্তানদের তরবীয়ত করেছেন। তাদেরকে সঠিক তরবীয়ত দিতে এবং পড়ালেখা শেখানোর আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। আর এ ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তিনি সফলকামও হয়েছেন। তার ইচ্ছা ছিল সন্তানরাও যেন পুণ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে আর এ কারণেই সন্তানদেরকে সেই পরিবেশ থেকে দূরে নিয়ে এসেছিলেন। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমার আওলাদের মধ্যে বংশ পরম্পরায় আহমদীয়াতের সেবক সৃষ্টি করতে থাকুন আর তাদেরকে পুরো বিশ্বস্ততার সাথে আহমদীয়াতের সাথে সম্পৃক্ত রাখুন। আল্লাহ্ তা'লা তারও মর্যাদা উন্নীত করুন। জুমুয়ার নামাযের পর এদের সবার গায়েবানা জানাযা পড়াব।

(জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ ও বাংলা ডেস্কের যৌথ প্রচেষ্টায় অনুদিত)